ATMADEEP
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-I, September, 2024, Page No. 33-41
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.01W.005

অনুরূপা বিশ্বাসের ‘নানা রঙের দিন’: অব্যক্ত ইতিহাসের গ্রন্থিমালা

ড. মধুমিতা সেনগুপ্ত, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আর্য্য বিদ্যাপীঠ কলেজ, গুয়াহাটি, আসাম, ভারত*
E mail: madhusengupta84@gmail.com

Received: 20.08.2024; Accepted: 27.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

The journey of autobiography in Bengali literature started from the 19th century. The history of autobiography through Devendranath Tagore, Rabindranath Tagore, Rassundari Daasi has reached the threshold of the twenty-first century. The tradition of autobiography can be seen in North East Bengali literature as well as in Bengal. However, unlike stories-novels-poems, no other literature has been discussed in the readership. If we make a list of the autobiographies of the Northeast written so far, the most notable autobiography comes to mind is the book 'Nana Rangar Din' in two volumes written by Anurupa Bishwas who is a noble and famous writer of Barak Valley in Assam. In this book not only, her personal life comes up, but all the information of the country and society is also captured by the author's pen. Our aim will be to outline the untold history of the Northeast based on Anurupa's autobiography.

Key Word: Autobiography, Anurupa, history, Bengali, northeast.

অটোবায়োগ্রাফি শব্দটি ড. উইলিয়াম টেইলর কর্তৃক ১৭৯৭ সালে ইংরেজি সাময়িকী The Monthly Review তে ব্যবহৃত হলেও আত্মজীবনী সাহিত্যরীতি হিসেবে অনেক পুরনো। কিন্তু জীবনীগ্রন্থ এবং আত্মজীবনীর মধ্যে আপাত সংশয় একটা থেকেই যায়। আলোচক সোমেন বসুর উদ্ধৃতি দিয়ে এ সংশয়ের নিরসন ঘটানো সম্ভব-"জীবনী লেখার অনেকটা নির্ভর করে ঘটনা সংগ্রহের উপর। কিন্তু আত্মজীবনীর চমৎকারিত্ব নির্ভর করে ঘটনা সংগ্রহের উপর নির্ভর নয়, আত্মপোলব্ধির উপর। তাই ঘটনাযোজনা করে জীবনী লেখা যায়। কিন্তু আত্মজীবনী ঘটনা সংযোজন মাত্রই নয়।'[১] আত্মজীবনীর মূল কথাই হচ্ছে জীবন ব্যাখ্যা। যে জীবন বিশ্বলোকের রূপ রস গন্ধের দোলায় আন্দোলিত হয় এবং সেই কথাগুলোই আত্মজীবনী রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়।

আধুনিক বাংলায় প্রথম লিখিত আত্মজীবনী বলতে দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীকেই বোঝায়। ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মপ্রচারের জন্য নয়, নিজের সংস্কার এবং বিশ্বাসকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যেই আত্মজীবনী লিখেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর মনে হয়েছিল যদি তাঁর আত্মজীবনী কোন কারণে তাঁর অহংপৌরষের গৌরবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাই তিনি গ্রন্থ-স্বত্বাধিকার দানপত্রে লিখেছিলেন-'আমি এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবে না।'[২] আত্মপ্রচারবিমুখ দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী কে প্রচারের মাধ্যম হিসেবে প্রকাশ্যে আপত্তি জানিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন'কেই আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী বলে ধরে নেই। উনিশ শতকে আত্মজীবনী সাহিত্যদরবারে স্বীকৃতি পাবার প্রাক মুহূর্তে নিজের জীবন অবলম্বনে লেখা পাঠ যে সাহিত্যের সামগ্রী বলে আদৃত হতে পারে এ ধারণা কারো ছিল না।

রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' বাঙালি পাঠকের কাছে এক আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হলো। রাসসুন্দরীর অ-আ-ক-খ শেখা থেকে শুরু করে পরিবারের সংস্কারের গণ্ডী পেরিয়ে সন্তান প্রতিপালন এবং সংসারের সমস্ত কর্তব্য পালন- আপাতদৃষ্টিতে এক সাধারণ নারীর গল্প। বাইরের জীবনের তরঙ্গ তাঁর নিভৃত জীবন স্পর্শ করেনি। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক পরিকাঠামো, মেয়েদের পরাধীনতা পর্দাপ্রথা প্রভৃতি নিখুঁত বর্ণনায় খুব সহজভাবেই 'আমার জীবন' এক সামাজিক দলিলে পরিণত হয়েছে।

> 'তখনকার লোকে বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবে। এতকাল ইহা ছিল না একালে হইয়াছে।[৩]

উনিশ শতকে এরপর আরো অনেকেই আত্মজীবনী লিখেছেন- যেমন রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত প্রভৃতি। মেয়েদের মধ্যে রয়েছেন রঙ্গনটী বিনোদিনী (আমার কথা), মনোদা দেবী (গৃহবধুর ডায়েরি)। শুরুটা হয়েছিল মূলত ঘরের কথা দিয়েই। 'আমার জীবনে' অক্ষর চেনা এবং শেখার লড়াই থেকে শুরু করে উনিশ শতকীয় বাংলার নারীর যে অন্তঃপুরকাহিনি বর্ণিত হয়েছে সেই উদ্যোগই প্রেরণা যুগিয়েছে পরবর্তীতে মেয়েদের নিজের কথা তুলে ধরার ইচ্ছায়। উনিশ শতকের নারীর নিজের কথায় নারীর বিরুদ্ধে গড়ে তোলা বিভিন্ন সংস্কার এবং প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করাই ছিল মূল কথা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। নারীর লেখালেখিতেও ঘটেছে নানা পরিবর্তন।

বিশ শতকে আত্মজীবনী বলতে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি', 'আত্মপরিচয়' এবং 'ছেলেবেলা'র কথা বলতে হয়। কিন্তু আত্মজীবনী রচনায় রবীন্দ্রনাথের বরাবর আপত্তি ছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি বলেছেন- "জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে, তাহা কোনও এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।"৪ আবার 'আত্মপরিচয়' এ বলেছেন- "আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে। আমার তাহা নাই"।[৫] আসলে নিজের দৈনন্দিন জীবনের তালিকা রচনা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল না। আর তাই তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ শুধুমাত্র জীবনের বৃত্তান্ত নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। এভাবেই এরপর আরো অনেকে লিখেছেন, যেমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

আমাদের আলোচ্য উত্তর-পূর্বের বাংলা আত্মজীবনী। যার সাথে জড়িয়ে রয়েছে উত্তর পূর্বের এক স্বতন্ত্র সামাজিক রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক ইতিহাস। শুরুটা কখন কবে থেকে হয়েছিল হয়তো জানা যায় না। কেননা দেশভাগের ফলে প্রব্রজিত বাঙালির যে নতুন যাপন তখন স্থাপিত হয়েছিল তার ফাঁকে ফাঁকে অনেকেই হয়তো ডাইরিধর্মী রচনাকারে আত্মকথা লিখেছিলেন। কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট উপায়ে সেসব প্রকাশের মুখ দেখেনি। তাই মোটামুটি ভাবে এপর্যন্ত প্রকাশিত উত্তর-পূর্বের আত্মজীবনী কিংবা স্মৃতিকথার আমরা একটা তালিকা করে নিতে পারি।

নং	আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশসাল
১।	উজান গাঙ বাইয়া	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১৩৯৬ বাং
২।	নানা রঙের দিন(১ম খণ্ড)	অনুরূপা বিশ্বাস	২০০৬
৩।	নানা রঙের দিন(২য় খণ্ড)	অনুরূপা বিশ্বাস	২০০৭
৪।	হারানো দিন হারানো মানুষ	সুজিত চৌধুরী	২০০৫ ইং
৫।	আমার কথা	অঞ্জলি লাহিড়ি	২০২২ ইং
৬।	সেই সকাল	ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য	২০১২ ইং
৮।	ছিন্নমূলের ছেঁড়াপাতা(১ম ও ২য় খণ্ড)	মুক্তি চৌধুরী	২০১৩ /২০২০ ইং
৯।	দিনান্তের বৈঠক	বিজিতকুমার ভট্টাচার্য	---
১০।	সুপ্রভা দত্তের ডায়েরি	সুপ্রভা দত্ত	১৪০৩ বাং
১১।	পাতার ভেলা ভাসাই নীরে	সবিতা দেব বর্মণ	২০১৫ ইং

১২।	সিলেট কন্যার আত্মকথা	বিজয়া চৌধুরী	২০০৪ ইং
১৩।	গবেষকের ডায়েরি	কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী	২০০১ ইং
১৪।	আমার কবি জীবন	পীযুষ রাউত	---
১৫।	নীল উপত্যকার রাখাল	প্রবুদ্ধসুন্দর কর	২০২২ ইং
১৬।	নিজের কথা কই	স্বপন কুমার দাস	২০১৮ ইং
১৭।	যখন পুলিশে ছিলাম	চুনীলাল রায় বর্ধন	২০১০ ইং
১৮।	শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলন(স্মৃতিকথা)	চঞ্চলকুমার শর্মা	১৯৮৪ ইং
১৯।	যে পথ দিয়ে এলাম	মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত	১৯৯৪ ইং

আরো কিছু আত্মজীবনী হয়তো উত্তর-পূর্বের সাহিত্য ভান্ডারে মজুত আছে যা এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল না। কিন্তু যে কয়টার নাম এখানে উল্লেখ করেছি তার সবগুলোর একসাথে এখানে আলোচনা হয়তো সম্ভব নয়। আমরা খুব সংক্ষেপে উত্তর-পূর্বের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে যাদের নিঃস্বার্থ অবদান জড়িত রয়েছে তাদের সংগ্রামটুকুকে কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টায় শুধুমাত্র অনুরূপা বিশ্বাসের 'নানা রঙের দিন' আত্মকথা কে বেছে নিয়েছি।

কবি সাহিত্যিক নারী মুক্তিবাদী অনরূপার জন্ম ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুন। বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলার পোস্ট অফিস কোয়ার্টারে কেটেছে তাঁর ছেলেবেলা। অসীম সাহসী এই মহিলার বোধশক্তি, মানবিক উৎকর্ষ, রাজনৈতিক সচেতনতা, দেশের প্রতি মমত্ব তাঁর রচনাসম্ভারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। মূলত কবি অনুরূপা বিশ্বাস বলেই তাঁর বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। পাঁচটি কবিতা সংকলন 'কিছু কিছু বৃক্ষ আছে বলে' (১৯৭৮), 'অদ্ভুত আঁধার এক'(১৯৮০), 'উনিশে মে আয়ুষ্মান হও'(১৯৯৪), 'তৃষ্ণার ভৃঙ্গার'(২০০০) ও 'কায়া তরুবর' (২০০২), ছড়া সংকলন 'ছড়া দিলাম ছড়ায়ে'(১৯৯৬)। তিনটি প্রবন্ধ সংকলন 'বরাক উপত্যকার নারী জাগরণ'(১৯৯৮), 'প্রসঙ্গ; বরাকের সাহিত্য'(২০০১), 'বরাক উপত্যকার অতীত ইতিহাসের সন্ধানে'(২০০৩)। এছাড়া রয়েছে তাঁর সম্পাদিত 'কৌতুক বিলাস' (১৯৯৬), নামক প্রাচীন পান্ডুলিপি। একটি ব্যক্তিগত রচনা 'দিয়া সোনা গল্প শোনো'। আর সবার উপরে রয়েছে তাঁর বিশেষ রচনা 'নানা রঙের দিন'। 'নানা রঙের দিন' দুটি খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খন্ডে তাঁর পারিবারিক জীবন, শৈশব এবং পড়াশোনার পাশাপাশি রাজনৈতিক জীবনে অভিষেকের ঘটনাবলীও উঠে এসেছে। কলেজে পড়াকালীন সময় থেকেই সাম্যবাদে অনুরূপার অভিষেক। এই উপমহাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীদের যোগদানের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত রয়েছে। অনুরূপা বিশ্বাস নিঃসন্দেহে তারই এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের বহু আগে থেকেই অবিভক্ত বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হয়। যদিও ১৯২৫ সালে যখন প্রথম সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় তারও আগে থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। ব্রিটিশদের অসহনীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে বারবার কৃষক শ্রমিক এবং মেহনতী মানুষরা ঐক্যবদ্ধ হতে লাগলো এবং ফলে অবিভক্ত বাংলায় বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হতে লাগলো। যদিও ১৯৪২ এর আগস্ট পর্যন্ত ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। ৪২ থেকে ৪৭ অব্দি এই পার্টির উদ্যোগে যখন কৃষক শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তখন নারীর আন্দোলনও দেশের টানে, অস্তিত্ব রক্ষার টানে অনেকটা সঙ্ঘবদ্ধ রূপ ধারণ করেছিল।

অনুরূপা বিশ্বাস এর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা যে অঞ্চলে সারাদেশের সঙ্গে সেইসব অঞ্চলেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ছায়া পড়েছিল। ইতিহাসের আঁধারে সেইসব সত্য মুখ লুকিয়ে থাকে অনেক সময়। ছোটবেলায় কিছুদিন বাবার কাছে কাছাড়ের বড়খলায় কাটালেও শিলচরে যখন ফিরে আসেন অনুরূপা ভর্তি হন স্বদেশী স্কুলে। স্বদেশী স্কুল চলে স্বদেশীয়ানার আদর্শে। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্যামাচরণ দেব। বিখ্যাত স্বদেশী, শিলচরের 'গান্ধী' নামে এক ডাকে সবাই চিনতো। গান্ধীবাদী সর্বত্যাগী এই নেতা ১৯২১ সালের আগস্টে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে সমগ্র কাছাড়ে যখন মুক্তি আন্দোলন শুরু করল, তখন থেকেই তিনি অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। অনুরূপা তাঁর 'নানা রঙের দিন'এর প্রথম খন্ডে জানান,

> কাছাড়ের আধুনিক পর্বের ইতিহাসের দিক দিকে চোখ ফেরালে দেখতে পাই যে, এখানে ১৯০৫ সালের বিখ্যাত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছেছিল কাছাড়ের অবিসংবাদিত জাতীয় নেতা কামিনী কুমার চন্দ তখন শিলচর পুরসভার প্রথম নেটিভ ভাইস চেয়ারম্যান। তিনি এখান থেকে প্রতিনিধি মূলক প্রতিবাদ প্রস্তাব পাঠান। তাঁর নেতৃত্বে স্থাপিত হয় 'কাছাড় স্বদেশী সভা'।"[৬]

অনুরূপার আত্মজীবনী এমন একটি মাইলস্টোন যা পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের থেকে দূরে অবস্থিত আরেক বঙ্গের অর্থাৎ কাছাড়ের সামাজিক রাজনৈতিক জনজীবনের তথ্য সমৃদ্ধ অজানা অধ্যায়গুলো তথ্যসহ তুলে ধরেছেন 'নানা রঙের দিনে'। 'আমার কথা; অংশে লেখিকা বলেছেন "আত্মজীবনী তো কতই লেখা হয় এটা সেই অর্থে তা নয়—জীবনস্মৃতি। যেখানে নিজের ব্যক্তিগত কথা থেকেও বড় হয়ে উঠেছে দেশ সমাজ, সমাজের ইতিহাস। যে ইতিহাসের ছোঁয়া লেগেছিল তাঁর বাল্যজীবনেই। স্কুলে থাকতেই প্রধান শিক্ষকের অহিংসা আদর্শে তাঁর প্রথম রাজনৈতিক শিক্ষা। এর মধ্যে ৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা- তখন তাঁর চোখের সামনে মিলিটারি, ট্রাক, ভিনদেশী সৈন্য সামন্ত এসে চেনা শহরটাই অচেনা হয়ে গেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে যখন যুদ্ধ ঘনিয়ে আসতে লাগলো, জাপানের আক্রমণ সম্ভাবনা বাড়ল, তখন উজান অসম ছেড়ে শিলচরে আত্মীয় কুটুম্বরা আসতে শুরু করলেন। অনুরূপা তখনও স্কুলে পড়েন। বুঝতে পেরেছিলেন শিলচরটা ছিল বেসক্যাম্প। ফ্রন্ট ছিল মণিপুরে। শরণার্থীর সংখ্যা ক্রমে বাড়ছিল।

শিলচরের বিখ্যাত চন্দ্র ভবনের পেছনে হেমচন্দ্র দত্তের স্ত্রী হিরণ কুমারী দত্তের তত্ত্বাবধানে নারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে রাশি রাশি খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল। স্বদেশী স্কুলের ছাত্রীদের কাজ ছিল শত শত

প্যাকেট তৈরি করা। অনুরূপাও সেই কাজে প্রতি ব্রতী হয়েছিলেন। শিলচরের আকাশে তখন ক্রমাগত যুদ্ধবিমান, বোমার আওয়াজ। অনুরুপার কথায়-

> "সেদিনকার বোমাবর্ষণ আমাদের ছেলেবেলাটা একেবারে তছনছ করে দিয়েছিল। সুন্দর শৈশব আর রইল না। শুরু হলো কঠিন জীবনসংগ্রাম। টিকে থাকার লড়াই।"[৭]

১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি তিনি সিলেট উইমেন্স কলেজে ভর্তি হন। আর তখন থেকেই মূলত কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর আত্মনিয়োগ। প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। মূলত ১৯৩৬ সাল থেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে মেয়েদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ শুরু হয়।অনুরূপার ক্ষেত্রে চেতনাটি এসেছিল পরিবার থেকে। বাড়ির পুরুষ আত্মীয় মেজদি রানীর স্বদেশী স্বামী রমেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। তাঁর আদর্শ ও নিষ্ঠাই সাম্যবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত করে অনুরূপাকে।

১৯৩৫ সালে সিলেট জেলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। তখনও ভারতবর্ষে এটি একটি বেআইনি সংগঠন। তাও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের আড়াল থেকে দেশ জুড়ে চলছিল কমিউনিস্টদের কাজ। সিলেট ও কাছাড় জেলায় কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয় ১৯৩৮ এ এবং এই কাজে গোড়াতে বারীণ দত্ত ও দিগেন দাশগুপ্ত চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিলেন। এই তথ্যগুলো মূলত উঠে আসে অনুরূপার আত্মজীবনী থেকে। যদিও অনুরূপা খুব সন্তর্পনে তার রচনাকে আত্মজীবনী বলতে চাননি। বলেছেন 'জীবনস্মৃতি'-তে-

> "জীবনস্মৃতিতে এতসব কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই- কাছাড়ের সেই সময়ে রাজনৈতিক অবস্থার একটা চিত্র তুলে ধরা। যদিও এসব আমার নিজস্ব জীবনস্মৃতি নয়। আমার বোধের জগতে তখনো এজাতীয় ঘটনার ছায়াপথ সম্ভবপর ছিল। তবে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি বা সাংস্কৃতিক পরিবেশ কিছুইতো স্বয়ম্ভু নয়। তার একটা ক্রম রয়ে গেছে, বিবর্তনের ব্যাপার আছ, তাই আগ বাড়িয়ে ইতিহাস নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা।"[৮]

অনুরূপা উল্লেখ করেছেন- কাছাড়ের কিংবদন্তি পুরুষ চন্দ পরিবারের অরুণ কুমার চন্দর কথা। যার সত্যাগ্রহ করে কারাবরণের দিনটির কথা লেখিকার বাল্যস্মৃতিতে সজীব হয়ে আছে। উদার জনদরদি নেতা ছিলেন বলেই কাছাড়ে কমিউনিস্টরা কংগ্রেসীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে পেরেছিল। তখন কাছের এর প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্য। ১৯৪৬ এর শেষ দিকে এসে অনুরূপাও পার্টি সদস্যপদ পেয়ে যান। এরপর শুরু হয় তাঁর দেশের জন্য, সমাজের জন্য অবিরত –সংগ্রাম। অনুরূপা উল্লেখ করেছেন-

> "৪৬ এর সে কী রূপ...একদিকে দেশজোড়া শ্রমিক, কৃষক ছাত্র সাধারণ মানুষের বিপুল জাগরণ, সাম্রাজ্যবাদীদের দেশছাড়া করার একাগ্রপণ, অন্যদিকে নেতৃত্বের আপসমুখিতা, ক্ষমতার লোভ, ভাগবাটোয়ারার বিশ্বাসঘাতী ষড়যন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত চেহারা। সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি চেহারাটা বেশ গোলমেলে হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে ভোজবাজির মতো স্বাধীনতার লগ্নটি কাছে চলে এলো।"[৯]

স্বাধীনতার পিছু পিছু দেশভাগেরও আয়োজন শুরু হল। মুসলমানপ্রধান পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে যাবে নিশ্চিত হয়ে গেল। আসামের জন্য বাকি থেকে গেল আরেক বেদনাদায়ক অধ্যায়।

> "আসাম প্রদেশের কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠী গোপীনাথ বরদলৈ যে দলের মুখ্য নেতা, সেই দলই চায় সিলেট কে পাকিস্তানে ঠেলে দিতে।।[১০]

অনুরূপার বিশ্বাস ছিল সিলেটের হিন্দু মুসলমান মিলে এ ভাঙন আটকে দেবে। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে গেল। দেশ এবং রাজনীতির এইসব ভাঙন অনুরূপাকে মূলত ভেতর থেকে দৃঢ় করে তুলেছিল। তাই তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই যোগ দিয়েছিলেন কৃষক আন্দোলনে। ১৯৪৬ এ অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানায় জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল কৃষকদের শ্রেণী আন্দোলন যা অনুরূপার লেখনীতে উঠে আসে স্পষ্ট ভাবে—

> "সামন্ততন্ত্রের শৃঙ্খল ভাঙার এই যে দুর্নিবার সংগ্রাম দেশের সর্বত্র প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ, পাবনা, যশোর এবং খুলনা থেকে শুরু করে ২৪ পরগনা, মেদিনীপুরেও ছড়িয়ে পড়েছিল দাবানলের মত।"[১১]

কাছাড় জেলাতেও ৪৬ থেকে তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হতে আরম্ভ করেছিল। কাছাড়ের মণিপুরী কৃষক সমাজ থেকে মূলত এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মনিপুরের জননায়ক হিজম ইরাবত সিংহ, তাঁরই বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত কমরেড সোনা সিংহ প্রমুখের সঙ্গে একসাথে উপত্যকার বিভিন্ন গ্রামে শহরে ঘুরেছেন অনুরূপা। সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমিক কৃষক ও মেহনতী মানুষদের সংগঠিত করতে কাজ করে গেছেন কলেজে পড়াকানের সময় থেকেই। অনুরুপা নিজেকে এইসব আন্দোলনের শরিক করে তোলেন। কাছাড়ে তখন থেকেই পার্টি বা সংগঠনের উপর দমননীতি শুরু হয়। এ সময় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জেলা সম্মেলনে যোগদানকারী আড়াইশো প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন কাছড়ের গ্রামাঞ্চলের মনিপুরী ও অন্যান্য জাতির কৃষক-নারী, চা ও রেল শ্রমিক নারী, এছাড়া ছিলেন শহরের ছাত্রী ও নারী আন্দোলনে যুক্ত নারীরা। সহজেই অনুমান করতে পারি এত প্রত্যন্ত অঞ্চলেও নারীসমাজে বিশেষ করে অন্ত্যজ নারীদের মধ্যেও এই বিদ্রোহের আগুন কীভাবে জ্বলে উঠেছিল। কৃষকদের নিয়ে বিপ্লব সফলের আশায় কলকাতার বিজয় মিছিলের অনুকরণে ১লা মে শিলচরেও বিজয় মিছিলের সিদ্ধান্ত হয়। আর এই মিছিল থেকেই গ্রেফতারের সম্ভাবনায় অনুরূপা আত্মগোপন করেন।

আত্মগোপন সম্পর্কে 'আমার অজ্ঞাতবাসের জীবন' নামে একটি অধ্যায়ই অন্তর্ভুক্ত করেছেন লেখিকা তাঁর আত্মকথায়। লিখেছেন

> "গ্রেপ্তার এড়িয়ে কাটিয়ে দিলাম অজ্ঞাতবাসের অসাধারণ দুটি বছর। কৃষক আন্দোলনকে জঙ্গি রূপ দেবার কর্মধারা এগিয়ে চলে।"[১২]

পার্টির নেতৃত্বে এভাবেই অনুরূপায এগিয়ে যান। তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতাদের সাথে এক হয়ে এভাবে রাজনৈতিক সামাজিক উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়া নারী তখন প্রায় নেই বললেই চলে। কৃষক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেন-

> "শুধু চোখের উপর তাদের মরতে দেখেছি। আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে দাঁড়িয়েও ফসল রক্ষার জন্য প্রতিরোধ গড়ে অকাতরে প্রাণ দিতে দেখে মনে মনে ভেবেছি তাদের পার্টি আনুগত্যের শ্রেণী সংগ্রামের বিশ্বস্ত সৈনিক রূপে অনন্য ভূমিকা পালনের কথা। গ্রামের মেয়েদেরও দেখেছি পাশে থেকে একাধারে বীরাঙ্গনা, অনাবিল স্নেহময়ী মা-বোন রূপ, দেখেছি তাদের সামাজিক চেতনা।"[১৩]

আত্মগোপন করা কালীন সময়ে অনুরূপা ছিলেন কাছাড়ের ভিতর গঙ্গাপুর এলাকায়। তাঁর এই আত্মগোপন শুধু আত্মগোপনই নয়, দেশের জন্য কতখানি আত্মত্যাগ, আত্মসংবরণ, কতখানি কঠোর জীবনযাপন আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি। আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনেও কাজ করে গেছেন অবিরত। কৃষক মেয়েদের শ্রেণী সংগ্রামের তথ্য বুঝাতে গিয়ে প্রথমে গন্তব্যস্থল বোয়ালজুর,তারপর রামনগ্ সেখান থেকে বড়খলা। এভাবে দল নিয়ে প্রতিকূল রাস্তা পেরিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের বার্তা পৌঁছে দিতে গিয়ে একবার ভিতরগঙ্গাপুর ফিরে আসার পথে তাদের দলের দুজন গ্রেফতার হন। কিন্তু পুলিশের চোখ অনুরূপাকে খুঁজে পায় না ।এভাবে গ্রেফতার এড়িয়ে এবং বিভিন্ন বিপ্লবী কাজের মাধ্যমে অনুরূপা কাটিয়ে দেন অজ্ঞাতবাসের দুটো বছর।

এই অজ্ঞাতবাস থাকাকালীন সময়ে সমাজের কাছে তাকে কমরেড কার্তিক বিশ্বাসের স্ত্রীর পরিচয়ে থাকতে হয়েছিল। কেননা ওখানে থাকতে গেলে একটা সামাজিক পরিচয় থাকলে ওদের পক্ষে গ্রহণ করতে সুবিধা হয়। এই অজ্ঞাতবাস থাকাকালীনই ক্ষেতমজুর সম্মেলন, ডিব্রুগড় গণনাট্য সংঘের রাজ্য সম্মেলনে তিনি নির্ভীক চিত্তে যোগ দিয়েছেন। গণনাট্য সম্মেলনে পুলিশ বাহিনীর আক্রমণ এবং গুলিচালনার অভিজ্ঞতা অনুরূপা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর লেখায়। এছাড়া ১৯৩৯ সালে ১ ডিসেম্বর বড়খলায় কৃষকদের ধান কাটার প্রস্তুতির দিনে যখন তেভাগা আন্দোলনের জোয়ার বইছে ভিতরগঙ্গাপুর এবং কাঞ্জিরামের অঙ্গনে লাল ঝান্ডা হাতে স্লোগান দিতে দিতে অনুরূপারা পার্টির সদস্যরা যখন ছোটখাটো মিছিল নিয়ে জমিতে নামলেন, তখনই পুলিশের অতর্কিত আক্রমণে রক্তপাত, কৃষক নারীর মৃত্যু এসবই অনরূপার স্মৃতিকথায় জ্বলন্ত ইতিহাস হয়ে আছে। অজ্ঞাতবাস নিয়ে অনুরূপা তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন এভাবে-

> "প্রকৃতপক্ষে ওটা ছিল আমার জীবনের পাঠশালা। শিক্ষক-অগণিত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। এ দেশের মানব সমাজে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে এখনো মানব সভ্যতা টিকে আছে।"[১৪]

কাছাড়ের মনিপুরী সমাজের কৃষক আন্দোলনের জোয়ার ব্যাপকভাবে এসেছিল। ভিতরগঙ্গাপুর ছাড়িয়ে মাঠ পেরোলে পাঞ্জিগ্রাম। ধানের অধিকারে রক্তাক্ত হওয়া কৃষকের আর্তনাদ শুনেছেন অনুরুপা সেখানে। জয় ,গৌর গৌরহরি সিংহ, সনাতন বাউরী ইবেমচা প্রমুখ্য কমরেড এর নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি এক সাধারণ ঘরের সংসারী মেয়ে কিংবা বধু হয়েও কাছাড়ের গণসংগ্রামে তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের বিস্মিত করে। পরবর্তী জীবনে তিনি ১৯৬০-এর আসামের 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনে আশ্রয় নেওয়া দুস্থ দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শিলচরের বিভিন্ন মহিলাদের নিয়ে গড়েছিলেন 'কাছাড় মহিলা ত্রাণ সমিতি'। সেই সংগঠনই পরবর্তীকালে 'কাছাড় মহিলা সেবা সমিতি'র রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। অনুরূপা বিশ্বাস আমৃত্যু নারীদের নিয়ে বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতিসমূলক কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন।

সূত্র নির্দেশ

১। বসু সোমেন, *বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী,* শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, ২৩বি বেথুন বো, কলিকাতা-৬, ১৯৫৬, পৃ: ১

২। শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর/গ্রন্থ স্বত্বাধিকার দানপত্র; শ্রী সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিতঃ *শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম মুদ্রণ ১৯২৭,পৃঃ ৩৫।

৩। দাসী রাসসুন্দরী, *আমার জীবন,* দে বুক স্টোর,১৯৮৭, পৃ ১৬।

৪।রবীন্দ্রনাথ: *জীবনস্মৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়,কলকাতা, ১৩৫০, পৃ ১।

৫। রবীন্দ্রনাথ: *আত্মপরিচয়,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়,কলকাতা, ১৩৫০, পৃ ১।

৬। বিশ্বাস অনুরূপা, *নানা রঙের দিন,*১ম খণ্ড, বরাক নন্দিনী প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ ৫৬

৭। তদেব, পৃ ৬১।

৮। তদেব,পৃ ৬৮।

৯। তদেব, পৃ ৭১।

১০। তদেব,পৃ ৭১

১১। তদেব, পৃ ৭৬।

১২। তদেব, পৃ ৯৪।

১৩। তদেব, পৃ ৯৫।

১৪। তদেব, পৃ ১০৪।